ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 805- 811
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.292

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস: যতটা ভৌতিক, ততটাই মানবিক

ড. অন্তরা চৌধুরি, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ভাগলপুর ন্যাশনাল কলেজ, বিহার, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Who asks whether ghosts exist or not? Some believe they do exist, while others think it is all strange imagination. Whether ghosts exist or not, ghost stories certainly continue to thrive. However, in the stories and novels of the eminent writer Shirshendu Mukhopadhyay, ghosts appear in a completely different form. Here, ghosts are not terrifying. They do not kill anyone, nor do they frighten people. Rather, they seem like very helpful friends. They are far more humane than they are supernatural. Perhaps this is why these ghosts have secured a permanent place in the minds of young readers.

Novels such as *Gosain Baganer Bhoot*, *Pagla Saheber Kabor*, and *Nrisimha Rahasya* have transcended their time to become timeless classics. There was a time when children would secretly read books written for adults. Shirshendu seems to have reversed that habit—now adults secretly read the stories and novels he wrote for children. This essay attempts an analytical discussion of some of his most memorable novels.

Keywords: Shirshendu, ghosts, Gosain Bagan, haunted clock, science fiction

ঠিক দুক্কুর বেলা যখন ভূতে মারে ঢেলা...।

ছোটবেলা থেকে সেই যে কথাটা শুনে ভূতের ভয়টা নিজের অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল- হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ। এই কথাটা শুনলেই মনে হত ভূত এসেই ঘাড় মটকে দেবে। ভূতকে চোখে না দেখলেও তার ভয়টা কিন্তু মনের কোণে বাসা বেঁধেই থাকে। ভূত মানেই গা ছমছমে ব্যাপার। ভূত মানেই হানাবাড়ি, ছায়া, নিশীথের ডাক। আবার বিভিন্ন প্রকারের ভূতদের উপদ্রব। যেমন- পেত্নী, শাঁকচুন্নী, ব্রহ্মদত্তি, স্কন্ধকাটা, আলেয়া, নিশি, মামদো, ডাইনি, গেছো, মেছো।

কিন্তু ভূত কাদেরকে বলে? ভূতের কি নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা আছে? ট্রাডিশনাল বিশ্বাস আর গল্পকথা অনুযায়ী ভূত হল মৃত মানুষের আত্মা, কখনও পশুপাখিদেরও; যার দৃশ্যত বা অন্য কোনওভাবে জীবন্ত বিশ্বে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। এই আত্মার যত্রতত্র অবাধ বিচরণে কোনও বাধা নেই। মানুষ যা করতে পারে না, ভূত তাই করতে পারে। অর্থাৎ অসাধ্য সাধন। অশরীরী হয়ে যেদিকে খুশি হাজির হয়ে যাবে। যার ওপর চাইবে তার ওপরই ভর করতে পারে। তাই ভূত নিয়ে মানুষের ফ্যান্টাসি ক্রমশঃ শিল্প সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ভূত-সাহিত্য নিয়ে মানুষের আগ্রহ চিরকালের। হয়তো চারিদিকে নগরোন্নয়নের ধাক্কায় ফাঁকা মাঠ, বেলগাছ, হানাবাড়ি

অন্ধকার নির্জন পথঘাট ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্যে সেরকম উচ্ছেদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে ভূতেরা বহাল তবিয়তে বসবাস করছে।

কিন্তু এইসব ভূতেদের চরিত্র কেমন? ভূত কি নিজে কখনও কাউকে ভয় পায়? পায় বইকি। আচ্ছা ভূত যদি বাঁদরের গায়ের গন্ধকে ভয় পায়, তাহলে তার ভূতামি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে। আবার ভূত যদি মুশকিল আসান হয় তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত একটা দৈত্য এসে যদি বলে, 'হুকুম মেরি আকা'।

কিংবা গুপী গাইন বাঘা বাইনের মত ভূতের রাজার যদি বর পাওয়া যেত, তাহলে ইচ্ছে মত খাওয়া আর ঘোরা যেত। মনের মধ্যে এরকম বাসনা থাকাটা দোষের কিছু নয়। আসলে রসেবশে বাঙালি একটু খেতে পেলে আর ঘুরতে পেলে আর কিছু চায় না।

বাস্তবে না হলেও কল্পনায় সেই সাধ পূরণ করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর সৃষ্ট মুষ্টিকয়েক কিশোর উপন্যাসে ভূতেদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তবে শুধু চরিত্র নয়, আপাত হালকা চালে লেখা সেই উপন্যাসে সমাজকেও তিনি দেখিয়েছেন বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে। তবে ভূত হোক বা কল্পবিজ্ঞান-এই ধারার লেখনীর সূত্রপাত কোথায়। একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজিতে শিশুদের জন্য সাহিত্য লেখা শুরু হয়। যেমন বানিয়ানের 'পিলগ্রিম প্রগ্রেস', ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', সুইফটের 'গালিভার ট্রাভেলস্' ইত্যাদি। ১৯৫০ এর পর থেকে শিশু সাহিত্যের রমরমা বাজার তৈরি হল বিদেশে। তৈরি হল নানা বয়সের উপযোগী গল্পের বই। ছেলেদের বই, মেয়েদের বই। কেউ কেউ হয়ে উঠলেন বিপুলভাবে জনপ্রিয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। তফাৎ শুধু কালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলার লেখালেখি নিয়ে বলেছিলেন, তখন ছেলেদের এবং বড়দের বইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। তাতে খুব বেশি কিছু ক্ষতিও হয়নি। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রচুরত জল মিশিয়ে যে সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাতে শিশুকে নিতান্তই শিশু বলে মনে করা হয়। তাদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা শিশু সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমকালে শিশু কিশোর সাহিত্য লেখা শুরু করেন। এই পর্যায়ের অন্যতম শিশু সাহিত্যিক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি প্রথম বাংলা শিশুসাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চ ধারাটি যুক্ত করেন। তবে তাঁর কাহিনিতে রহস্য রোমাঞ্চ সৃষ্টির চেষ্টা যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতা ততটাই অবহেলিত ছিল।

এই অভাব পূরণ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ ও বিদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, দুর্গমতা ও ভীষণতাকে গবেষক সুলভ নিষ্ঠায় প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবের মত জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি। ছোটদের জন্য লেখা লীলা মজুমদারের গল্পগুলিতে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর সৃষ্ট ভূতও মানুষের হিতৈষী প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে।

সাধারণত শৈশব ও তারুণ্যের মধ্যবর্তী সময়কেই কৈশোর বলে। আর যেসব সাহিত্যকর্ম সমাজ প্রার্থিত বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত হয় তাকেই শিশু সাহিত্য বলে। অবশ্য এই জাতীয় শাখার শ্রেণীভেদও আছে। এর কিছু অংশের পাঠক চার-পাঁচ বছরের আর কিছু দশ-বারো থেকে তেরো চোদ্দ বছরের শিশুরা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কিশোরের চোখ দিয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মেশানো এক অদ্ভুত রসের জগৎ তৈরি করেছেন যে জগতে শিশুরাই স্বাভাবিক, বয়স্ক মাত্রই বাতিকগ্রস্ত। শীর্ষেন্দুর এই

উপন্যাসগুলি শিশুদের কল্পনা উদ্বোধক ও ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক। শিশুদের মনোজগৎ তিনি খুব ভালোভাবেই চেনেন। তাই এ ধরনের রচনায় কিশোর মনোজগৎ অপূর্ব শৈল্পিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

অদ্ভুত বলতে বোঝায় যা ভূত নয় আবার বাস্তবও নয়। ভূতের গল্পের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে তা এই উপন্যাসগুলোতে নেই। আবার বাস্তব উপন্যাসের বিশেষত্বও নেই। দুইয়ের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে একটা বিস্তৃত গল্প-যা পড়তে পড়তে আমাদের একবারও মনে হয় না যে লেখক এমন কিছু আলোচনা করেছেন যা অসঙ্গত। কারণ সেটা আমাদের কাছে খুব সঙ্গত বলেই মনে হয়। উপন্যাস হল সেটাই যেখানে লেখকের একটা সামগ্রিক জীবন দর্শন থাকবে। চরিত্রের মাধ্যমে একটা বিরাট জীবনসত্যে পৌঁছে দেবে। শীর্ষেন্দুর এই উপন্যাসগুলো কি সত্যই আমাদের বিরাট জীবন দর্শনে পৌঁছে দিতে পারে? ক্ষণিক আর চিরকালীন আবেদনের এখানেই পার্থক্য হয়ে যায়। শীর্ষেন্দুর 'মানবজমিন', 'যাও পাখি', 'পার্থিব' আমাদের কাছে চিরকালীন। কিন্তু অদ্ভুতুড়ে সিরিজের গল্পগুলো আমাদের যে একটা অদ্ভুত আনন্দ দেয় সেই আনন্দের অনুরণন ক্ষণিকের। ভূত আছে কি নেই-এই বিতর্কের ধার ধারেন না লেখক। লোকবিশ্বাসে স্থিত ও জাত ভূত-পেত্নিরা আছে-এই স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব মেনে নিয়েই তিনি লিখতে বসেন। ভূতেরা তাঁর লেখায় মানুষের মতো স্বাভাবিক চরিত্র এবং যথেষ্ট সামাজিকও। মানুষের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কোনও শত্রুতার সম্পর্ক নেই তাদের। তারা মানুষের সংসার ছেড়ে গিয়েও মানুষের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকে। শীর্ষেন্দুর সৃষ্ট ভূতেরা সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকে। তাদের অধিকাংশই যথেষ্ট বিবেচক। এমনকী বেশ দয়ায় মায়ায় ভরা মন তাদের। বিশেষ করে জীবিত উত্তর প্রজন্মের প্রতি তাদের যথেষ্ট স্নেহ-প্রীতি এবং কর্তব্য বোধ আছে। এই ভাবেই গড়ে ওঠে আখ্যানের বুনোট। এই উপন্যাসগুলি মিলনান্তক সামাজিক কমেডি ধরনের লেখা। বালক ও কিশোরদের জন্য লেখা গল্প উপন্যাসের এই ঘরানা আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু শীর্ষেন্দু বড়দের জন্য লেখা উপন্যাসেও এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সার্থক-এই অর্থে, এখানে বয়স্ক পাঠকেরা ভূত আছে কিনা- এই প্রশ্ন নিয়ে আদৌ ভাবাতুর নন। ভূতেদের তাঁরা মানুষের মতোই স্বাভাবিক চরিত্র বলে মেনে নেন। তাতে উপন্যাসের রস আস্বাদনে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হয় না। আপাত লঘুতার আবরণে এই লেখাগুলোতে ধরা থাকে জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্যময় রূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মধুর অন্তিম পরিণতির দ্যোতক হলেও বিষাদ গভীর অনুভবও সেখানে স্থান পায়। হৃদয় ও মননের গভীরতা এই জাতীয় লেখাতে স্থান পায়।

শীর্ষেন্দুর সৃষ্ট ভূতগুলো ভীষণ অদ্ভুত ধরনের। তারা পরোপকারী। রামকে মোটেই তারা ভয় পায় না। কখনও রাম নাম শুনে তারা আঁতকে ওঠে, আবার কখনও কোনও রামকেই তারা কেয়ার করে না। ভূত আবার বেখেয়ালে নিজেই রাম কবিরাজের নাম উচ্চারণ করে বসে। কোন ভূত আবার বাঁদরের গায়ের গন্ধকে ভয় পায়। পুরো ব্যাপারটাই ভারি গোলমেলে। সবথেকে মজার ব্যাপার হল, গল্প বলতে বলতে ভূত আছে-এই ব্যাপারটা নিঃশব্দে শিশুদের মনের মধ্যে তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন, আবার সেই ভূতকে যে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, সেই বোধটাও তিনি পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। অধিকাংশ ভূত পূর্বপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়েছে। বংশধর বিপদে পড়লে ভূত হয়ে এসে তাকে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন ধরনের ভূতের সংগ্রহশালা তাঁর ভূতের উপন্যাসগুলি। ভূতটাই ভীষণ অদ্ভুত যা ভাবিয়ে তোলে। কিছু কিছু উপন্যাসে ভৌতিক পরিসমাপ্তি আছে।

'গোঁসাইবাগানের ভূত' উপন্যাসেও অদ্ভুত এবং ভূতুড়ের সমাহার আছে চমৎকার। বুরুণ অঙ্কে তেরো পেয়ে ফেল করেছে। তাই মনের দুঃখে গোঁসাই ডাকাতের বাগানে ঢোকে। সেখানে নিধিরাম ভূতের সঙ্গে দেখা করে। সে জলের ওপর হেঁটে, হাত লম্বা করে মগডাল থেকে চালতা পেড়ে, মুন্ডু খুলে পরিষ্কার করে, ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত খুলে তলোয়ারের মত ঘোরালেও বুরুণ ভয় পায় না। আসলে মানুষ যখন প্রচণ্ড কষ্ট পায় তখন কোনও অতিলৌকিক ঘটনাকেই সে ভয় পায় না। এতে নিধিরাম ঘাবড়ে যায়, ভয় পায় গোঁসাইবাবা তাকে

নীচের পোস্টে নামিয়ে দেবে। ভীত নিধিরাম ভূত বুরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার যাবতীয় কঠিন অঙ্ক নিমেষে করে দেয়, ভাল ইংরেজি লিখে দেয়, ক্রিকেটে কৃতিত্ব এনে দেয়, স্পোর্টসে পুরস্কার পেতে সাহায্য করে। ফলে নিধিরাম ভূত হয়ে যায় নিধিদা। দাদুর বন্ধুদের চিত্রও চমৎকার। প্রসঙ্গত তারা তোলে বদমাশ হাবুর কথা যে জেলে আছে। হাবুর অতীত আসে বিস্তৃতভাবে। অরস্কান্ত-র মনে হয় 'হাবু মানুষ নয়'। মানুষ ও ভূতের পারস্পরিকতা। একে অন্যের আচরণে ঢুকে পড়া শীর্ষেন্দুর এ ধরনের লেখার বৈশিষ্ট্য।

নিধিরাম একসময় বুরুণকে ছেড়ে যেতে চায়, 'নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো এবার'। এভাবেই হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে জীবনের চিরন্তন সত্য এবং নীতিশিক্ষা নিঃশব্দে রক্তে মিশে যায়। এই উপন্যাসে বিজ্ঞান, রূপকথার আবহ, অ্যাডভেঞ্চার, ভূত ও মানুষ, অদ্ভুত ও বাস্তব চমৎকার মিশে গেছে। হাবুর ভালো হওয়া দেখান লেখক। শুভবোধ ও মঙ্গলবোধে লেখকের আস্থা জীবন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

'নৃসিংহ রহস্য' পড়তে পড়তে মনে হয়, শীর্ষেন্দুর এই ধরনের গল্পগুলোতে একটা কমন ব্যাপার আছে। যেমন, একটা জঙ্গল ঘেরা মফঃস্বল, একান্নবর্তী পরিবার, একজন ঠাকুমা ভূত। একটা লোক গল্পের শুরুতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শেষে তাকে পাওয়া যায়। থাকে একটা জাঁদরেল দারোগা। আর বেশিরভাগ গল্পেই থাকে কবিরাজ, ছিঁচকে চোর ইত্যাদি। এই উপন্যাসে গয়েশবাবু খুন হয়েছে-এই খবর পাওয়া যায় রাতে। দেখা যায় যেটাকে ডেডবডি বলে মনে হয়েছিল, সেটা একটা গোড়াকাটা কলাগাছ। মুন্ডুর মতো জায়গাটা মৌচাক। অনেক গল্পের মতো দাবা খেলা আছে এখানে। দারোগার মতে থানায় ইনফরমেশন না দিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া চলবে না। গয়েশবাবু একজন শিকারী। গভীর রাতে তিনি নাকি পিঁপড়েদের কথাবার্তা শুনতে পান। এই উপন্যাসে ভৌতিক আবহ তৈরির একটা নিষ্ফল প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

'ভুতুড়ে ঘড়ি' উপন্যাস শুরু হয় দাদুর ঘড়ি হারানোর মধ্য দিয়ে। তিনশো বাইশটা ঘড়ি হারিয়ে যিনি বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। হারানবাবুর বড় ছেলে কলকাতা থেকে তার বাবাকে একটা নতুন ধাঁচের ঘড়ি এনে দেয়। সেই ঘড়ি থেকে নানারকম ভৌতিক উপদ্রব তৈরি হয়। রাত্রে সেই ঘড়ি থেকে কথা শোনা যায়, গান হয়। কিন্তু ভাষা বিচিত্র। শীর্ষেন্দুর এই ইলিউশন ব্যাপারটা চমৎকার। কারণ রেডিওতে নানা ভাষার কথা ও গান হয় সারা রাত্রি। হারান ঘড়িটা ঠিক করতে দেয় তান্ত্রিক জটাইকে। জটাইয়ের মতে এই ঘড়ির মালিকের আত্মা ঘুরঘুর করছে ঘড়ির কাছে। শব্দ সব ভৌতিক। জটাই ঘড়িটা শোধন করে ভূতমুক্ত করে দিতে চায়। এদিকে মেজো ছেলে ফটো তুলেছিল ঘড়িপরা ঘুমন্ত বাবার। কিন্তু ছবি ওয়াশ করার পর দেখা গেল ছবিতে হারান নেই, শুধু ঘড়িটা আছে। সে সময় থেকে বাড়ির সব ঘড়িগুলো উল্টোদিকে চলতে থাকে। তান্ত্রিকের পোষা ভূত বাঞ্ছারাম। তান্ত্রিকের ঝগড়ার নিত্য সঙ্গী বৈষ্ণব নিত্য দাস। ঘড়ি থেকে যেসব শব্দ ওঠে তার মধ্যে আছে, রামরাহা, ঘ্রাচঘ্রাচ প্রভৃতি। ঘড়িটা থেকে হারাণদাদু ও ঠাকুমা মৃদু ও ভারি শব্দ শুনতে পায় যা 'একটু শুনলেই নেশা লেগে যায়। বুকটা ঠান্ডা হয়ে আসে।' এরপর গর্ডনের তৈরি যন্ত্রমানবের কথা, ভূতের হার চুরি চলন্ত ট্রেন থেকে প্রভৃতি আছে।

উপন্যাসের শেষে জটাই জানায়- 'ভূতের স্বভাবই ওই। যখনই কিছু ছাড়তে হয় তখনই রেগেমেগে ভাঙচুর করে যায়। তোমার ঘড়িটার ভূত হে। যেই তাড়িয়েছি, অমনি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তেজ ছিল খুব ব্যাটার।' ভূতের রহস্যময় প্রেক্ষাপটে কল্পবিজ্ঞানের এই উপন্যাস বেশ উপভোগ্য।

'গৌরের কবচ' উপন্যাসে অলৌকিকতা বিস্তর। 'কবচ' এখানে হয়ে উঠেছে যাবতীয় শক্তিমত্তা ও অপরাজয়ের প্রতীক। গরিব বাড়ির মা-বাপ মরা ছেলে গৌর বকুনি খায়, ঘরের কাজ করে, বৌদির ভাই-মাউ আর খাউ আসার পর তার ওপর অত্যাচার বাড়ে। আর আছে ফকির সাহেব ও তার আরশি, যাতে জমা আছে

হাজার কয়েক ভূত। বয়স তার আড়াইশ। ভয় তাড়ানোর তেল চায় গৌর ওর কাছে। আর কবিরাজ মশায়ের বয়সও একশ অতিক্রান্ত। খাউ আর মাউয়ের ঘর থেকে নিশুতি রাতে বেরিয়ে আসে ঢ্যাঙামতো একটা লোক। দাদার নির্দেশে সে রাতে খেয়ে পায় না। তাকে জেগে থেকে চোর পাহারা দিতে হয়। চোর গোবিন্দ তার প্রতি দরদী, রাতে তার জন্য রুটি তরকারি নিয়ে আসে। কবচটা সে হারানোয় সবাই বকাবকি করে। কবচটা যোগেশ্বরের-যিনি ছিলেন নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এই কবচ শরীরে থাকলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এক সময় গোবিন্দর সাহায্যে ছুঁচোর গর্ত থেকে কবচটা পাওয়া যায়। এরপর রয়েছে আরও বিভিন্ন ঘটনা। শীর্ষেন্দুর এই উপন্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য-নিরীহ সরল এক ছেলের নিগ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে মুক্তি। এই উপন্যাসটিও এলোমেলো ছোট গল্পে ছুটে যায়নি। নানা উত্তেজক দৃশ্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষের দিকে গেছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা-এটাও অধিকাংশ গল্পের মতো এখানেও দেখা যায়। ভাষা বর্ণনা একেবারে গল্পের উপযোগী। চরিত্র চিত্রণ বিশেষতঃ ফকির বাবা অত্যন্ত জীবন্ত।

'পাগলা সাহেবের কবর' উপন্যাসের গবেট ছাত্র হরিবন্ধু 'গোঁসাই বাগানের ভূত' উপন্যাসের বুরুণের মতোই, দু'জনের বাবাই ডাক্তার। হেডমাস্টার পর পর দু'বছর ফেল করা হরিবন্ধুকে টি সি দিতে চান। গগনবাবুর পেশেন্ট দুখীরামবাবুর বাড়ি সাঁওতাল পরগণায়। পাশেই খুব নাম করা বেঙ্গলি স্কুল। হরিকে শেষ পর্যন্ত মোতিগঞ্জেই পাঠানো সাব্যস্ত হল। স্বভাবতই হরির মন খারাপ। কিন্তু সে নিরুপায়। ক্লাসে প্রথম দিনেই ছেলেরা তাকে হেনস্থা করল। কিন্তু বন্ধুত্ব হল গোপালের সঙ্গে সে জানায় কুসুমগঞ্জ বাড়িতে ভীষণ ভূতের ভয়। জানা যায় এখানে আছে এক পাগলা সাহেব। হরির পরিচয় হল পটল দাস চোরের সঙ্গে। পটল ভোজবাজির মত অদৃশ্য হতে পারে। সে জানে অনেক কিছু (হস্ত লাঘব, মুখবন্ধন, বায়ু নিয়ন্ত্রণ, কুম্ভকা)। গোপাল তাকে চিঠি দিয়ে কুসুমগঞ্জে যেতে বারণ করেছিল। ওখানেই রাজর্ষিরা গোপালকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়। এ গল্পে অন্য গল্পের মতই মানুষ ভূত হয়ে যায়, ভূত মানুষ হয়ে বন্ধুত্ব করতে আসে।

এরপর আসে পাগলা সাহেবের মিস্টিরিয়াস কবর। হরি একদিন আবিষ্কার করল তার থাকার ঘরের ছবির আড়ালে একটা সুড়ঙ্গ। সে অগ্রসর হয়। সেখানে সে পটলকে মার দিয়ে ফেলে যাওয়া দেখতে পায়। হরি আক্রান্ত হয়। পটল বন্দি দু'জনের হাতে, আর একজন গেছে হরিকে আনতে। পটল তার ওষুধের শিশি শুকিয়ে একটা লোককে কাবু করে। হরির সাহায্যে তাকে একটা ঝোপের মধ্যে রাখে। আর পাওয়া যায় সাদা একটা ঘোড়ার বিদ্যুচ্চমকে ছুটে যাওয়া। হেডমাস্টার হরিকে স্কুলে নিজের ঘরে ডেকে একটা সাংকেতিক ছড়ার ব্যাখ্যা করতে বলেন। হেডমাস্টার বলেন লোকের বিশ্বাস পাগলা সাহেবের কবরের তলায় যে জায়গা সেখানে শ্বাস নিলেই রাজা হওয়া যাবে। পাগলা সাহেব হরিকে দু-দুবার বাঁচান। হরি যে পাগলা সাহেবের কবর দেখেছে তা শুনে ঝিকু, টুবলু অবাক হয়ে যায়। পটল আতঙ্কিত, পাছে একারণে কোন বিপদ ঘটে। হরি বন্দি হয়। যারা বন্দি করে তারা পাগলা সাহেবকে চায়। ঝুমরী ও দুটো বাচ্চা মেয়ে বন্দি হয় ওদের হাতে। ঝিকু সর্দারও বন্দি। ঝিকুরা নাকি বাপ-ব্যাটায় পাগলা সাহেব সেজে সাদা ঘোড়ায় চেপে লোককে বোকা বানাত। পাগলা সাহেব এসে হরিকে মুক্ত করে। হরি এবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। এই উপন্যাসে ম্যাসেজ-এর মোড়কে দুটো নীতিশিক্ষা আছে। তা হল-ভালো লোককে এমনকি ঘোর পাপীরাও খাতির করে।

ভূতের গল্পের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। সেখানে এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অশরীরী, যারা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তান্ত্রিত নয়, যারা একটি স্থান, কিছু মানুষকে তাদের অস্তিত্বে আতঙ্কিত করে থাকে। মৌখিক থেকে লিখিত ভৌতিক গল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শীর্ষেন্দুর পূর্বসুরী হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকটি ভূতের গল্প ('ভূতের বাড়ি', 'কেন এত নিদয় হইলে') প্রভৃতি মনে পড়ে। এঁরা দু'জন ভূতকে মানুষের কাছে এনে দিয়েছেন। ভূত সমাজে মানব চরিত্রের এমনকি জাত বিভাগের ব্যাপারও এনেছেন। এই দুই লেখকের

গল্পই আতঙ্কবিস্তারী নয়, আনন্দবিস্তারী। একটা নীতিবোধের সুর ও স্বর আছে। ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসি রচনায় সমকালীনদের মধ্যে শীর্ষেন্দু অতুলনীয়। সেক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা অতীব প্রশংসনীয়। সেক্ষেত্রে মজা রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। তা চরিত্রের নামকরণে স্পষ্ট। যেমন-বুড়ি ঝি কিরমিরিয়া, গোরুর নাম হ্যারিকেন, বাচ্চা ছেলে ভূতুম, কাদামামা, ঘুসুরাম, হনুমান, ঘটোৎকচ, কবি সদানন্দ, মহলানবিশ, দারোগা বজ্রাঙ্গ।

আবার এই উপন্যাসগুলোতে শীর্ষেন্দুর চোখ দিয়ে এক অতি সাধারণ সমাজের কথা ধরা পড়েছে। সমাজের মনন ফুটে উঠেছে এই গল্পগুলিতে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা উঠে এসেছে। সমাজে বদমাইশ লোক যেমন আছে, তেমনি আছে ঠগবাজ, অসৎ লোকও। শীর্ষেন্দু যেহেতু হাসির গল্প লিখেছেন সেহেতু চরিত্রগুলোকে হাস্যরসের মোড়কে তৈরি করেছেন। খলনায়ককে পুরোপুরি খলনায়ক না বানিয়ে তার মধ্যে একটা হাস্যরসের মোড়ক ঢুকিয়ে দেন। খারাপ চরিত্রগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। চরিত্রগুলির মধ্যে কমন গ্রামের কাপালিক যারা মন্ত্র টন্ত্রের দ্বারা দেখায় যে ভূত পুষেছি বা বাঘ পুষেছি। কাপালিক হয়তো ঘটনাচক্রের দ্বারা কিছু দেখে নিয়েছে কিন্তু সে বলে যে তাকে নাকি ভূতে খবর দিয়েছে। দারোগাগুলি সাধারণতঃ পেটমোটা, নাদুস নুদুস, কাজের কিছু নেই। সমাজের পুলিশগুলো যেমন সেরকম। কিন্তু লোকের কলাটা মুলোটা নেবার ধান্দা। উপঢৌকন পেতে ভালোবাসে। বিনা পয়সায় পেলে খুবই খুশি হয়।

বেশিরভাগ গল্পেই বিচিত্রপ্রকার চোর আছে। বুদ্ধিমান চোর, ছিঁচকে চোর এবং চোরের প্রতি সহানুভূতি আছে। গ্রামের পরিবেশ, ঝোপঝাড়, পোড়ো বাড়ি, সিয়াকুল, জলা শহরের ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। 'বনি' গল্পে বিদেশের পটভূমি আছে, বাকি সব গল্পে বাংলা গ্রামের পরিবেশ যেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটবেলা কাটিয়েছেন।

এই গল্পগুলোতে অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্র বা রাজতন্ত্রকে দেখানো হয়েছে। জমিদারের জমিদারত্ব নেই। লেঠেলদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাগত দিক থেকে প্রচুর উপমা পাওয়া যায়। যেমন-বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, অমাবস্যার চাঁদ প্রভৃতি। জ্যোতিষী আছে। তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চরিত্রও দেখা যায়। চাষী, কাজের লোক, মাস্টারমশায়, পুরোহিত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ উঠে এসেছে।

শীর্ষেন্দু এই ধরনের গল্প উপন্যাসকে বলতে চান অদ্ভুতুড়ে। এর মধ্যে কোনও নারী চরিত্রের বড় ভূমিকা নেই। সমসাময়িক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজচিত্র নেই। এ এক মফঃস্বলের উদ্ভিদ পরিবৃত অঞ্চল যেখানে চিরন্তন সমস্যা আছে। ঝরঝরে ভাষায় হালকা মেজাজে তিনি গল্পগুলো লিখেছেন। সমাজের বিভিন্ন সৎ ও অসৎ চরিত্রগুলোকে নিয়ে তিনি মজা করেছেন। পুলিশও তাঁর গল্পে সৎ ও অসৎ কিছুই নয়। তাদেরকে নিয়ে মজা করাটাই আসল উদ্দেশ্য। এখানে সাহিত্যের আধুনিক দর্শন না খোঁজাটাই স্বাভাবিক। এই গল্পগুলো বাচ্চাদের কল্পনার জগৎকে কিছুটা প্রসারিত করে। কিছুটা বাস্তব কিছুটা অবাস্তব মিলিয়েই এই জগৎ। বাচ্ছা এবং বড়দের কাছে এই উপন্যাসগুলো এত আকর্ষণের কারণ হল, এই উপন্যাসগুলো পড়তে পড়তে হারিয়ে যাওয়া যায় সব পেয়েছির দেশে। ভূত সম্পর্কে পুরোনো সংস্কার ভেঙে দেবার চেষ্টা আছে, তেমনি সততারও পরাভব নেই। গল্পের কিশোর চরিত্র অনেক সময় পড়াশোনায় অপটু; কিন্তু দায়িত্ববোধ, সাহসিকতায়, আত্মত্যাগে, মিত্রতা রচনায়, রোমাঞ্চকর অভিযানে হয়ে ওঠে প্রশংসনীয়। হয়তো এই ধরনের রচনার জনপ্রিয়তার এটি একটি কারণ। শিশুদের মনোজগৎ তিনি অত্যন্ত ভালোভাবেই বোঝেন। তাই এই ধরনের রচনায় কিশোর মনোজগৎ অপূর্ব শৈল্পিকতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

ভূতের ভয় পাওয়া দিয়েই এই লেখার শুরু হয়েছিল। আমাদের হাল ফ্যাশনের বাড়ি ঘরে এখন অ্যান্টিক কালেকশন ঠাকুমা দিদিমার সাদা কালো ছবির স্থান নেই। কাজেই ওই ছবির মধ্যে থেকে তাঁদের জীবিত হয়ে সতর্ক করার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম-

'এই ভূতেদের নিয়ে তোরা কী সব মশকরা শুরু করেছিস বলতো? তেনাদের খেপিয়ে তুল্লে অছেরেদ্দা করলে আর রক্ষে থাকবেনি কো...।'

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। কিশোর উপন্যাস সমগ্র। ভলিয়াম ১, আনন্দ পাবিলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট, ২০১১।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দত্ত, বীরেন্দ্র। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ দ্বিতীয় খণ্ড। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন-আগস্ট, ১৯৮৫, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪।

২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকাঃ বাংলা ছোটগল্পের একশ। বিশ বছর/১৮৯১-২০১০, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯১২, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬।